প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের জীবন সংক্ষেপ

প্রথম অধ্যায়

জীবনানন্দ দাশের জীবন সংক্ষেপ

যে কোন কবি গল্পকার বা ঔপন্যাসিক তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে বেঁচে থাকেন আবহমান কাল। সময়ের স্রোতধারায় লেখকের ব্যক্তি পরিচিতি অপ্রাসঙ্গিক বা গৌণ হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু লেখকের সৃষ্টিশীল সত্তার যথার্থ অনুধাবনে তাঁর ব্যক্তি সত্তার উন্মোচনও প্রয়োজন। ঔপন্যাসিক জীবনানন্দকে অনুধাবন করতে গেলেও তাই স্বাভাবিকভাবেই জীবনানন্দের ব্যক্তি জীবনের অনুধ্যান সংক্ষেপে হলেও প্রয়োজন।

জীবনানন্দ দাশ (ডাকনাম মিলু) ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ (বাংলা ৬ই ফাল্গুন ১৩০৫) বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে বিষ্ণু দে সম্পাদিত 'একালের কবিতা'-র ভূমিকায় জানা যায় "কবি-পত্নী লাবণ্য দাশের মতে কবির জন্ম সাল ১৮৯৮।"[১] কবির পিতামহ সর্বানন্দ দাশের আদি নিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। কার্যোপলক্ষে সর্বানন্দ তাঁর মূল পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে আসেন এবং পরবর্তীকালে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই ধর্মগ্রহণের পর বৈদ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ 'গুপ্ত' কথাটি তিনি অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁদের পরিবার 'দাশ পরিবার' নামেই পরিচিত হল। দেশের বাড়ির সাথে সম্পর্ক প্রায় ঘুচে গিয়ে বরিশালেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে লাগলেন সর্বানন্দ দাশ ও তাঁর পরিবার পরিজনেরা। পদ্মার কবলে গ্রামটি বিপন্ন হওয়ায় তিনি বরিশালে নতুন করে ঘর বাঁধেন। "তাঁর ছিল সাত ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলেরা হলেন — হরিচরণ, সত্যানন্দ, যোগানন্দ, প্রেমানন্দ, অতুলানন্দ, ব্রহ্মানন্দ ও জ্ঞানানন্দ।"[২] সর্বানন্দের পুত্র সত্যানন্দ কবির পিতা। কবির পিতা সে যুগে স্নাতক ডিগ্রীধারী ছিলেন এবং তিনি স্কুল শিক্ষকতায় যুক্ত ছিলেন। তাছাড়া তিনি 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি বেশ কিছু প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। সত্যানন্দ ছিলেন বরিশাল ব্রাহ্ম সমাজের একজন অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। তাঁর ধ্যানগম্ভীর ও উদার-প্রশান্ত মুখচ্ছবির পাশাপাশি ছিল ঋষিকল্প মনন। সত্যানন্দের এই শান্ত-সমাহিত জীবনকে ঘিরেই জীবনানন্দের ব্যক্তিত্বে রোপিত হয়েছিল ধ্যান-তন্ময়তার বীজ। সর্বানন্দের মধ্যে যে অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতা ছিল তা তিনি তাঁর পুত্রের ভিতর সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। স্বনামধন্য কবি কুসুমকুমারী দাশ হলেন জীবনানন্দের মা। কুসুমকুমারীর পিতা চন্দ্রনাথ দাস ছিলেন বরিশালের গৈলা গ্রাম নিবাসী। কুসুমকুমারীর জন্মের পূর্ব হতেই সত্যানন্দ

দাশের পরিবারের সাথে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। আশৈশব কুসুমকুমারী একটি বিদ্যানুরাগী পরিমন্ডল পেয়েছিলেন। ছোটোবেলা থেকেই কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন তিনি। পরবর্তীকালে বিবাহ ও সংসার জীবন তাঁর লিখনকর্মে বাধা হল না বরং তাঁর সাহিত্য চর্চায় আনুকূল্যই করল। বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজের উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদান করতেন কুসুমকুমারী। সেখানে স্বরচিত ছোট ছোট প্রবন্ধও পাঠ করতেন তিনি। তাঁর ব্যক্তিত্বে একটি নিজস্বতা ও স্বকীয়তা ছিল। কর্তব্যবোধ ও ঔচিত্যবোধ ছিল সুদৃঢ়। এমনই মায়ের সন্তান জীবনানন্দ। মায়ের সান্নিধ্যেই যে তাঁর সাহিত্যানুরাগ সর্বপ্রথম জন্মেছিল সেকথা অনস্বীকার্য। কবিরা দুই ভাই — জীবনানন্দ দাশ ও অশোকানন্দ দাশ এবং এক বোন —সুচরিতা দাশ।

১৩০৯ বঙ্গাব্দের দিকে কবির শিক্ষা জীবন শুরু হয় বাড়িতে মায়ের কাছে। ১৩১৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসে (ইং ১৯০৮, জানুয়ারি) ন' বছর বয়সে তিনি বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হন। স্কুলে পড়াকালীন জীবনানন্দ কঠিন অসুখে আক্রান্ত হলে শিশু জীবনানন্দ মাতা ও মাতামহ চন্দ্রনাথ দাশের সঙ্গে লক্ষ্ণৌ, আগ্রা, দিল্লি ভ্রমণে গিয়েছিলেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ার সময় পিতা সত্যানন্দ দাশ অসুস্থ হয়ে পড়লে জীবনানন্দ মামার বাড়ির আত্মীয়দের সঙ্গে গিরিডিতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য বসবাস করেছিলেন। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে আসায় জীবনানন্দের জীবনে তাঁর গভীর প্রভাব পড়েছিল। বরিশাল শহরে, কীর্তন খোলা নদীর ধারে, আশেপাশের গ্রামে, ক্ষেতে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্য বই ক্রয় করেছেন। স্কুল জীবনের উপান্তে নিজের লেখা কিছু কবিতা রবীন্দ্রনাথকে পাঠান। কবিতাগুলির বর্তমানে কোনও সন্ধান পাওয়া যায়নি। ১৩২২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৫) বরিশাল ব্রজমোহন বিদ্যালয় থেকে জীবনানন্দ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে আই. এ. ক্লাসে ভর্তি হলেও পরীক্ষা দেওয়ার বয়সকাল পূর্ণ না হওয়ায় এক বছর তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৭) বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাশ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। আই. এ-তে তাঁর বিষয় ছিল ইংরেজি, বাংলা ও রসায়ন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় হিন্দু হস্টেলের পরিবর্তে অক্সফোর্ড মিশনেই বসবাস করেন। এরপর ১৩২৬ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৯) কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ইংরেজিতে অনার্স সহ স্নাতক হন। মনোমোহন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় 'বর্ষ আবাহন' নামে প্রথম মুদ্রিত কবিতার মাধ্যমে ১৩২৬ বঙ্গাব্দ থেকে তাঁর সাহিত্য

ক্ষেত্রে প্রবেশ। উক্ত কবিতাটির শেষে শুধু 'শ্রী' উল্লেখিত হয়েছিল। জীবনানন্দ দাশ বি. এ. পাস করার পর 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যার (চৈত্র) সূচিপত্রে 'বর্ষ আবাহন' কবিতার লেখক 'জীবনানন্দ দাশ বি. এ.' নাম উল্লেখ করা হয়। এ বছরই তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. (ইংরেজি) ও আইন ক্লাসে ভর্তি হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ডিঞ্জ হস্টেলে বসবাস শুরু করেন। এম. এ. পরীক্ষার কিছুদিন আগে 'ব্যাসিলারি ডিসেন্ট্রি' রোগে আক্রান্ত হয়ে পরীক্ষায় না বসার সিদ্ধান্ত নেন। পরে পিতার অনুরোধে পরীক্ষায় বসেন। ১৩২৮ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২১) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ দ্বিতীয় বিভাগে এম. এ. (ইংরেজি) পাস করেন। কিছুদিন আইন নিয়ে পড়াশোনা করলেও শেষ পরীক্ষাটি দেননি।

১৯১৭-১৯২১ সাল পর্যন্ত জীবনানন্দ কলকাতার মেস ও ছাত্রাবাসে থেকে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন জীবনের কঠোর-কর্কশ, সুন্দর-অশ্লীল দিকগুলির মুখোমুখি হলেন। জীবনের এক ভিন্ন মুখ দেখবার অভিজ্ঞতা তাঁর হল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন কলকাতার মানব সভ্যতার ও রাষ্ট্রীয় শোষক শক্তিগুলির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের ফলে জীবনানন্দের মন প্রবল এক ঝাঁকুনি খেয়ে কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হল। সেই সত্য থেকে পরবর্তীকালে তিনি এককণাও বিচ্যুত হলেন না। তাঁর সাহিত্যেও তার ছাপ রয়েছে। জীবনানন্দের পৃথিবীতে মানুষের কল্যাণবোধ ও মঙ্গল আদর্শ লুপ্ত হয়ে যায়নি। তাঁর বিশ্ব কেবলই শয়তানের আবাসস্থল হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মানুষের জীবন প্রতিমুহূর্তে বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামরত। জীবন এমন একটা জিনিস যা মানুষের অতিপ্রিয়, আকর্ষণীয় ও সম্মোহনের আধার। পরম করুণাময়ের আর সে না করলেও পৃথিবীতে বাসযোগ্য করবার ও জীবনের গতিপথে সচল রাখবার জন্য বহু আয়াসসাধ্য কাজ করে তার আশাকে বাঁচিয়ে রাখে। কারণ — "এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। সে অনেক শতাব্দীর মনিষীর কাজ" — ('সুচেতনা')। — অনীশ্বরবোধের শক্তিতে জীবনানন্দ কেবল রবীন্দ্রনাথ থেকেই নন, সমকালীন অন্যান্য কবিদের থেকেও পৃথক অবস্থান গড়ে তুলেছেন। সে বৈচিত্র্যের স্পর্শ মেলে তাঁর সাহিত্যের পাতায়।

এরপর ইংরেজি ১৯২২ সালে কলকাতার সিটি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের জুনিয়র অধ্যাপক (টিউটর) পদে কর্মজীবন শুরু করেন। সিটি কলেজে কর্মরত অবস্থায় জীবনানন্দ হ্যারিসন রোডে (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) অবস্থিত প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ বসবাস শুরু করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে বরিশাল থেকে তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশ এম. এসসি. পড়বার জন্য কলকাতায় এলে ১৮/২/এ বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে একটি ছোট ঘর ভাড়া নেন। তিনি বেচু

চ্যাটার্জি স্ট্রিট থেকে সিটি কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকেন। ১৩৩২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে বেদনাহত জীবনানন্দের কবিতা 'দেশবন্ধুর প্রয়াণে' 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সে বছরেরই ১৫ই আশ্বিন তাঁর পিতামহ কালীমোহন দাশের জীবনাবসান ঘটে। 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় অগ্রহায়ণ–পৌষ সংখ্যায় তাঁর 'স্বর্গীয় কালীমোহন দাশের শ্রাদ্ধবাসরে' শীর্ষক সাধুভাষায় রচিত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে জীবনানন্দের 'ঝরাপালক' (ইং ১৯২৭) কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। এ সময় থেকেই জীবনানন্দ 'দাশগুপ্ত' পদবির পরিবর্তে 'দাশ' হয়ে যান। ছোট ভাইয়ের চাকুরিস্থল পুনা ও বোম্বাই ভ্রমণ করে আসেন তিনি। 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হবার কয়েক বছরের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশ কাব্যসাহিত্যে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তরুণ কবির সমস্ত কবিতাতেই তারুণ্যের উল্লাস ধ্বনিত। ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৮) সিটি কলেজের চাকরি থেকে জীবনানন্দ কলেজ কর্তৃপক্ষ দ্বারা অপসারিত হন। এই সম্বন্ধে নানা মতামত থাকলেও আসল কারণ রামমোহন রায় ছাত্রাবাসের একদল ছাত্রের সরস্বতী পুজোকে কেন্দ্র করে গোলমাল দেখা দিলে ছাত্রসংখ্যা কমে গিয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে এই কলেজের সবচেয়ে কনিষ্ঠ অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে জীবনানন্দ চাকরি থেকে বরখাস্ত হন।

১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৯২৯) প্রায় এক বছর বেকার অবস্থায় থাকার পর সদ্য প্রতিষ্ঠিত বাগেরহাট প্রফুল্লচন্দ্র কলেজে মাত্র তিনমাস অধ্যাপক রূপে কর্মরত ছিলেন জীবনানন্দ। কার্তিক মাসে সেই কলেজের শিক্ষকতার পদ থেকে ইস্তফা দেন তিনি। অগ্রহায়ণ মাসে কলকাতায় ফিরে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিংয়ে বসবাস করতে শুরু করেন ও গৃহশিক্ষকতার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে থাকেন। এরপর মহাত্মা অশ্বিনী কুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র সুকুমার দত্ত যিনি দিল্লির রামযশ কলেজের উপাধ্যক্ষ ছিলেন, তাঁর প্রচেষ্টায় জীবনানন্দ (পৌষ মাসে) ঐ পুরনো দিল্লি থেকে এক শুষ্ক অনুর্বর 'কালাপাহাড়' এলাকায় অবস্থিত সেই রামযশ কলেজের ইংরেজির অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। "ডিসেম্বর ১৯২৯ থেকে মার্চ ১৯৩০ পর্যন্ত জীবনানন্দ ওই কলেজে চাকরী করেছেন।" [৩]

১৩৩৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জীবনানন্দ ছুটি নিয়ে রামযশ কলেজ থেকে বরিশালে আসেন। ২৬শে বৈশাখ (ইং ৯ই মে) খুলনা জেলার সেনহাটির রোহিণী কুমার গুপ্তর কন্যা শ্রীমতী লাবণ্যের সঙ্গে জীবনানন্দের ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ মন্দিরে ব্রাহ্ম মতে বিবাহ হয়। বিবাহ ও

অনুষ্ঠানের আচার্য হন মনোমোহন চক্রবর্তী। ঢাকায় রামমোহন লাইব্রেরিতে বিবাহবাসরে বুদ্ধদেব বসু, অজিতকুমার দত্ত প্রমুখ কবিবন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। ৩১শে বৈশাখ, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে নববধূর সংবর্ধনা উপলক্ষে সর্বানন্দ ভবনে বউভাত অনুষ্ঠান এবং বিশেষ উপাসনা হয়। ৫ই আষাঢ় জীবনানন্দের মাতামহী প্রসন্নকুমারী ছিয়াশি বছর বয়সে বরিশালের সর্বানন্দ ভবনে দেহত্যাগ করেন। ৩রা ফাল্গুন রবিবার (ইং ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩১) জীবনানন্দ ও লাবণ্যদেবীর এক কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। তার নাম রাখা হয় মঞ্জুশ্রী (ডাকনাম মঞ্জু)।

১৯৩১ সালে তাঁর সাহিত্যকর্মের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাই এইসময় তিনি 'পূর্ণিমা' (ইং ১৯৩১, নভেম্বর) উপন্যাসটি রচনা করেন। এই সালেই তাঁর রচিত ছোটগল্পগুলি হল — 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়', 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে', 'মাংসের ক্লান্তি', 'উপেক্ষার শীত', 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস', 'বিবাহিত জীবন', 'নকলের খেলায়', 'মা হবার কোনো সাধ', 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা', 'প্রেমিক স্বামী' ইত্যাদি।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯৩২) জ্যৈষ্ঠ মাসে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দাশ আই. এ. পাশ করেন। ১৯৩২ সালে জীবনানন্দ দাশ দুটি উপন্যাস রচনা করেন। 'কল্যাণী' (জুলাই), 'জীবনের উপকরণ' (আগষ্ট)। এই সালে রচিত ছোটগল্পগুলি হল — 'পাতা-তরঙ্গের বাজনা', 'আর্টের অত্যাচার', 'মহিষের শিং', 'বিস্ময়', 'শাড়ি', 'কোনো গন্ধ', 'বত্রিশ বছর পরে', 'চাকরি নেই', 'প্রণয় প্রেমের ভার','বাসরশয্যার পাশে', 'বাসর ও বিচ্ছেদ', 'কুষ্ঠের স্ত্রী', 'সুখের শরীর', 'নষ্ট প্রেমের কথা', 'বাসররাত', 'প্রণয়ী-প্রণয়িনী', 'মেয়েমানুষের রক্তমাংস', 'একঘেয়ে জীবন', 'কিন্নরলোক', 'হৃদয়হীন গল্প', বিবাহ অবিবাহ', 'শীতরাতের অন্ধকারে', 'বাসনাকামনার গন্ধ', 'অঘ্রাণের শীত', 'অশথের ডালে', 'সমুদ্রের স্রোতের মতো', 'বিচ্ছেদের কথা' ইত্যাদি।

১৯৩৩ সালে জীবনানন্দ দাশের সাহিত্যকর্মের মধ্যে তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত অসহায়তা, অর্থহীনতা ও দারিদ্র্য ও মানসিক দ্বন্দ্বের প্রতিফলন দেখতে পাই। এইসময় তিনি রচনা করেন বেশ কয়েকটি উপন্যাস ও ছোটগল্প। উপন্যাসগুলি হল — 'বিভা' (ফেব্রুয়ারী), 'মৃণাল' (ফেব্রুয়ারী),'বিরাজ' (আগষ্ট), 'কারুবাসনা' (আগষ্ট), 'জীবনপ্রণালী' (আগষ্ট), 'প্রেতিনীর রূপকথা' (সেপ্টেম্বর)। ছোটগল্প — 'তাজের ছবি', 'মজলিশে', 'লোভ', 'মানুষ-অমানুষ', 'কল্পজিনিশের জন্ম ও যৌবন', 'ঐকান্তিক অতীত', 'ক্ষমা-অক্ষমার অতীত', 'স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ', 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে', 'প্রণয়হীনতা', 'আকাঙ্ক্ষার জগৎ', 'মৃত্যুর গন্ধ', 'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা', 'লোকসানের মানুষ', 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর', 'মানুষের মুখের

31 MAY 2013
NBU LIBRARY
252139

আড্ডা', 'জন্মমৃত্যুর কাহিনী', 'জাদুর দেশ' ইত্যাদি।

এরপর ১৩৪২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩৫) লাবণ্য দাশ বরিশাল কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। সে বছরেই শ্রাবণ (আগষ্ট) মাসে জীবনানন্দ তাঁর জন্ম-শহর বরিশালের ব্রজমোহন কলেজের ইংরেজি বিভাগের টিউটর পদে যোগ দেন। ১৬ই আশ্বিন (৩রা অক্টোবর) রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের 'মৃত্যুর আগে' শীর্ষক কবিতা সম্পর্কে জানান — "জীবনানন্দ দাশের চিত্ররূপময় কবিতাটি আমাকে আনন্দ দিয়েছে।" পরের বছর অর্থাৎ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩৬) ১৩ই অগ্রহায়ণ (২৯শে নভেম্বর), রবিবার তাঁর একমাত্র পুত্র সমরানন্দ (ডাকনাম রঞ্জু) বরিশালের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন।

১৩১৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯৩৬) কলকাতা থেকে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশিত হয়। এছাড়া সেই বছরই কয়েকটি ছোটগল্পও তিনি রচনা করেছেন। সেগুলি হল — 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ', 'মেহগিনি গাছের ছায়ায়', 'করুণার রূপ', 'এক এক রকম পৃথিবী', 'বাইশ বছর আগের ছবি', 'কবিতা আর কবিতা', 'তারপরেও আবার কবিতা, তারপরেও আবার কবিতা', 'কুড়ি বছর পরে', 'রক্তের ভিতর', 'মনোবীজ', 'রক্তমাংসের স্পন্দন', 'কবিতা নিয়ে', 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'পৃথিবীটা শিশুদের নয়', 'করুণার পথ ধরে', 'মায়াবী প্রাসাদ', 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি', 'সোনালি আভায়', 'বাসনার দেশ', 'সাধারণ মানুষ', 'আস্বাদের জন্ম', 'এক সেতুর ভিতর দিয়ে', 'কুড়ি বছর পর ফিরে এসে', 'বৃত্তের মতো', 'ভালোবাসার সাধ' ইত্যাদি।

২০শে ফাল্গুন (৫ই মার্চ, ১৯৩৭) জীবনানন্দ 'পরম পূজনীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের শ্রীচরণকমলেষু/শ্রদ্ধাবনত জীবনানন্দ/২০ ফাল্গুন ১৩৪৩' — কথাটি নিজের হাতে লিখে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। তার সঙ্গে নিজের অভিপ্রায় জানিয়ে একটি দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখ করেছিলেন প্রায় নয় বছর আগে তিনি তাঁর প্রথম কবিতার বই একখানা রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। সেই বই পেয়ে তিনি তাকে চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিখানি তার মূল্যবান সম্পদের মধ্যে একটি। ২৭শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ, ১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ বিশদভাবে লেখার পরিবর্তে দু'পংক্তির চিঠিতে জানান, তাঁর কবিতাগুলি পড়ে তিনি খুশি হয়েছেন। জীবনানন্দের লেখায় রস, স্বকীয়তা এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে। ১৩৪৪ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মাবকাশে কলকাতায় থাকার সময় জীবনানন্দ প্রমথ চৌধুরীর বাসায় গিয়ে একখণ্ড 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' দিয়ে আসেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল 'বিচিত্রা'

পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হোক। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন বুদ্ধদেব বসু। ২৩শে জ্যৈষ্ঠ (৭ই জুন) প্রমথ চৌধুরীকে জীবনানন্দ একটি চিঠিতে অনুরোধ করেন — তৃপ্তি দিক, অতৃপ্তি দিক — তাঁর কাব্যে কোনো গুণ থাকুক বা অনেক দোষ থাকুক, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে তাঁর সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর যা মনে হয়েছে সে সম্বন্ধে 'বিচিত্রা'য় একটা বড় প্রবন্ধ লিখলে তিনি নিজেকে অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করবেন।

এরপর ২রা মাঘ (১৬ই জানুয়ারি) বরিশালের সাহিত্য পরিষদ শাখার শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় সাহিত্যরসের ব্যাখ্যা করে জীবনানন্দ একটি উচ্চ অঙ্গের প্রবন্ধ পাঠ করেন। ১৩৪৫ বঙ্গাব্দের 'কবিতা' পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যায় জীবনানন্দ দাশের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের প্রথম বাক্য দুটি ছিল এরকম — "সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।" ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের বাইশে শ্রাবণ কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রয়াত হলে বরিশাল কলেজের ছাত্রাবাসের উঁচু ক্লাসের ছাত্রদের উদ্যোগে আয়োজিত রবীন্দ্র স্মরণসভায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন জীবনানন্দ দাশ।

১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ৫ই অগ্রহায়ণ (২২শে নভেম্বর, ১৯৪২) বরিশালের বাড়িতে জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাশের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল আশি বছর। ২০শে অগ্রহায়ণ পিতা সত্যানন্দ দাশের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে জীবনানন্দ তাঁর পিতার সর্বাঙ্গীন পরিচয় তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ঋষিতুল্য মানুষটির জীবনে বিচিত্র সাধনার উল্লেখ করে পাঠ করেন একটি প্রবন্ধ। এই রচনার প্রথম দু-তিন অনুচ্ছেদে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বাবা সত্যানন্দ দাশের সম্বন্ধে ভাবতে গেলেই মনে হয়, ভিতরের সঙ্গে বাইরের জীবনের যে বিরোধে একদিকে মানুষের ব্যক্তিমানস ও তার ব্যবহারিক ও জনমানস আশ্রয়ী জীবনের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায় তাঁর বেলায় তা তেমন নিঃশেষে ঘটে উঠতে পারেনি। সেই বছরেরই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে পৌষ মাসে বুদ্ধদেব বসুর উদ্যোগে 'কবিতা ভবন' থেকে জীবনানন্দের 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে, জ্যৈষ্ঠ মাসে গ্রীষ্মের ছুটিতে টালিগঞ্জ রসা রোডে ছোট ভাই অশোকানন্দের বাড়িতে জীবনানন্দ কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করেন। ১৩ কার্তিক (৩০শে অক্টোবর) সুকুমার রায়ের জন্মতিথি উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে 'সিগনেট প্রেস' উদ্বোধন হলে, সেখানে আমন্ত্রিত হন জীবনানন্দ। কিন্তু জীবনানন্দ অনুপস্থিত ছিলেন। তিনি উদ্যোক্তাদের জানিয়েছিলেন, 'তাঁদের আমন্ত্রণলিপি যখন তাঁর কাছে এসেছে তখন তিনি বরিশালে ছিলেন না। এখানে আসার পর তাদের চিঠি দেখলেন। এখন আর সময়ে

কুলোবে না, অল্পের জন্য কবির স্মৃতি সভায় উপস্থিত থাকতে না পারায় তিনি এত বেশি দুঃখিত যে কবির আগামী জন্মতিথি উপলক্ষে স্মৃতি সভায় তাঁকে ডাকতে তাঁদের একান্ত অনুরোধ জানিয়েছেন। সে বছরেরই মাঘ মাসে বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের যুগ্ম সম্পাদনায় 'ফ্যাসি বিরোধী' লেখক ও শিল্পী সংঘ' ১৯৪২-এর ২৮শে মার্চ গঠিত হলে, জীবনানন্দ দাশকে একটি প্রবন্ধ লেখার আমন্ত্রণ জানানো হয় 'কেন লিখি' শীর্ষক একটি পুস্তিকার জন্য। এই পুস্তিকাটি জীবনানন্দ দাশের লেখা সহ প্রকাশিত হয়। ফাল্গুন মাসে ইংরেজি তর্জমায় বাংলা কবিতার একটি সংকলন প্রকাশে 'সিগনেট প্রেস' উদ্যোগ নিলে জীবনানন্দকে অনুরোধ জানানো হয়, তাঁর নিজের কয়েকটি কবিতা অনুবাদ করে পাঠানোর জন্য। যেখানে প্রধান অনুবাদক পল্টনকর্মী ও কবি মার্টিন কার্কম্যান। চৈত্র মাসে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের অনুরোধে 'শঙ্খমালা', 'হায় চিল', 'আমি যদি হতাম', 'মনোবীজ', 'বিভিন্ন কোরাস' ও 'আলোক স্তম্ভ' কবিতাগুলির ইংরেজি অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন জীবনানন্দ।

১৩৫১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে (ইং ১৯৪৪) তাঁর 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ বিয়ের পর অব্যবহিত পাঁচ বৎসর প্রায় কর্মহীন ছিলেন। মাঝের কিছুদিন জীবনানন্দ বীমাকর্মী ছিলেন। আবার তিনি ব্যবসাও করেছেন। কিন্তু কোনটিতেই সাফল্যের মুখ না দেখায় ১৯৩৫ সালে যোগ দেন বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে। ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি সেখানে কর্মরত ছিলেন। ১৩৫৩ বঙ্গাব্দের ২৩ শে আষাঢ় (ইং ১৯৪৬) বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে প্রায় দু'মাসের সবেতন ছুটি নিয়ে কলকাতায় আসেন তিনি। সে বছরে হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করলে আগস্ট মাসের শেষদিকে জীবনান্দ পুলিশের ঝামেলায় পড়েন। বি. এম. কলেজে তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র তখন একটি থানার দায়িত্বে থাকায় তাঁকে নিরাপদ দূরত্বে পার করে দেন। দু'মাস ছ'দিন ছুটি কাটানোর পর ২৯শে ভাদ্র কলকাতা থেকে ফিরে বরিশাল বি. এম. কলেজে যোগ দেন। কার্তিক মাসে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ লেখেন। তিনি লেখেন — 'মহাবিশ্বলোকের ইসারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা তাঁর কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই তিনি বুঝেছেন, গ্রহণ করেছেন। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই তাঁর কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে। ২৪শে কার্তিক বরিশাল কলেজে পূজাবকাশের পরে কলেজ খুললেও জীবনানন্দ আর যোগদান করেননি। ৭ই পৌষ বরিশাল বি. এম. কলেজের কাউন্সিল সভায় সিদ্ধান্ত করা হয় যে — ১১ই নভেম্বর থেকে পরবর্তী গ্রীষ্মাবকাশের

শেষ দিন পর্যন্ত যেন বিনা বেতনে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয়। সভার কার্য বিবরণে আরও একটি সিদ্ধান্ত লেখা হয় — জীবনানন্দ দাশকে যেন পরবর্তী জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহের মধ্যে গ্রন্থাগারের যাবতীয় বই ফেরত দেওয়ার কথা জানানো হয়। ১২ই মাঘ (২৬শে জানুয়ারি, ১৯৪৭) কলকাতার ক্রিক রো থেকে হুমায়ুন কবির সহ আরও কয়েকজনের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'স্বরাজ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলে সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সত্যপ্রসন্ন দত্তর ঐকান্তিক ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই পত্রিকার 'রবিবাসরীয়' বিভাগে সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত হন জীবনানন্দ।

১৩৫৪ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে জীবনানন্দ বরিশাল থেকে সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে চাকরিতে ইস্তফা দেন। ২৪শে শ্রাবণ 'স্বরাজ' পত্রিকায় যোগদানের পর রবিবাসরীয়তে 'মনমর্মর' নামে জীবনানন্দ একটি বিভাগ খোলেন। এই বিভাগেই তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' শিরোনামে একটি নিবন্ধ লেখেন। জীবনানন্দের দায়িত্বে এই বছর প্রথম 'স্বরাজ'-এর পুজো সংখ্যা প্রকাশের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভাদ্র মাসে জীবনানন্দ দাশের উদ্যোগে তাঁর ছাত্র (পরবর্তীকালে খ্যাতনামা সাহিত্যিক) নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'স্বরাজ' পত্রিকায় 'বৈতালিক' নামে একটি উপন্যাস লেখেন। আশ্বিন মাসে 'স্বরাজ' পত্রিকার আর্থিক সংকট দেখা দেওয়ায় পুজোর আগেই স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দেন জীবনানন্দ।

১৩৫৫ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাসে (ইং ১৯৪৮) জীবনানন্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই বইটির জন্য তিনি অগ্রিম একশত টাকা লেখক-স্বত্ত্ব হিসেবে পেয়েছিলেন। বই লিখে সম্ভবত এই তাঁর প্রথম প্রাপ্তি। ১৯৩৩ সালের পর জীবনানন্দ দীর্ঘ ১৪ বছর আর উপন্যাস রচনায় হাত দেননি। এরপর স্বাধীনতা-দেশভাগ ইত্যাদি নানা কারণে বরিশাল ত্যাক করে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করলেন ও ১৯৪৮ সালে চারখানি উপন্যাস লিখে ফেললেন। সেগুলি হল — 'জলপাইহাটি' (এপ্রিল-মে), 'মাল্যবান' (জুন), 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'সুতীর্থ'। কার্তিক মাসে ছোটভাই অশোকানন্দ দিল্লিতে বদলি হয়ে গেলে ১৮৩ ল্যান্সডাউন রোডে জীবনানন্দ সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। ৯ই পৌষ (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৪৮) কলকাতায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা অশোকানন্দের ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউয়ের বাসস্থানে প্রায় তিয়াত্তর বছর বয়সে জীবনানন্দের মাতা কুসুমকুমারী দাশের জীবনাবসান হয়।

দক্ষিণ কলকাতায় বিবেকানন্দ পার্কের পাশে কমলা গার্লস স্কুলে এক বৎসরের জন্য শিক্ষিকার কাজে নিযুক্ত হন লাবণ্য দাশ। সে সময়ে বিষ্ণু দের স্ত্রী প্রণতি দে ছিলেন ওই স্কুলের

প্রধান শিক্ষিকা। অর্থোপার্জনের জন্য জীবনানন্দ গৃহশিক্ষকতা করতেন। তাঁর ভাড়া বাড়ির একটা অংশ কিছুদিনের জন্য মেজর এইচ. কে. মজুমদারকে ভাড়া দেন। মেজর মজুমদার মাস কয়েক ভাড়া ছিলেন। পূর্বেই জানিয়েছি, জীবনানন্দ ইন্‌সিওরেন্সের এজেন্সি নিয়েছিলেন, কিন্তু সেখানেও ব্যর্থ হন। ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের পরিচিত 'নিরুক্ত' পত্রিকার লেখক কবি অমল দত্তকে চারটি ঘরের মধ্যে একটি ঘর ভাড়া দেন জীবনানন্দ। তাঁর সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য একটি বিদ্যালয় খোলার পরিকল্পনা নেন, কিন্তু তা বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। মাঘ মাসে (২২শে জানুয়ারি কলকাতার সিনেট হলে 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্র'-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর প্রেরিত অভিনন্দন বাণীটি সভায় পাঠ করা হয়। আলোচ্য সভায় বারো জন সদস্যের একটি কমিটি গঠিত হলে জীবনানন্দ অন্যতম সভ্য হন। কার্যকরী সমিতিতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা হলেন — আবু সয়ীদ আইয়ুব (সভাপতি); জীবনানন্দ দাশ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র (সহ-সভাপতি), দিনেশ দাশ, অম্লান দত্ত, প্রভঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গোপাল ভৌমিক, নারায়ণ চৌধুরী, সন্তোষ কুমার ঘোষ ও অনিল চক্রবর্তী (যুগ্ম সম্পাদক) ও আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত (সংগঠন সম্পাদক)। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে 'সমকালীন সাহিত্যকেন্দ্রে'র মুখপত্র হিসেবে বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য ও সুহৃদ রুদ্র সম্পাদিত 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪) রূপান্তর ঘটে। নব পরিকল্পিত পত্রিকার সম্পাদনা পরিষদের সদস্য নিযুক্ত হন তিনজন — জীবনানন্দ দাশ, আবু সয়ীদ আইয়ুব ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র। সে বছর লাবণ্য দাশ ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি. টি. কোর্সে ভর্তি হন। ১৩৫৭ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসে অম্লান দত্ত শারদীয় সংখ্যা 'দ্বন্দ্ব'-র জন্য সম্পাদকীয় লেখার আমন্ত্রণ জানালে তার পরিবর্তে জীবনানন্দ 'আধুনিক কবিতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠান। 'সম্পাদকীয়'র পরিবর্তে রচনাটি প্রথম প্রবন্ধ হিসেবে ব্যবহার করলে ঠিক হবে হয়ত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

১৬ই ভাদ্র (২রা সেপ্টেম্বর) সদ্য প্রতিষ্ঠিত খড়্গপুর কলেজে (জুলাই ১৯৪৯) ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দেন জীবনানন্দ। খাওয়া থাকার খরচ সহ নামমাত্র বেতনে পড়াতে হত তাঁকে। তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল খড়্গপুরের পুরাতন বাজারে কৌশল্যা মোড়ের কাছে সিলভার জুবিলি ইন্‌স্টিটিউটের সংলগ্ন ভাড়া করা কলেজ ছাত্রাবাসের একটি বাড়িতে। কার্তিক মাসে কবি-পত্নী লাবণ্য দাশ এনজাইনা রোগে অসুস্থ হয়ে পড়েন। মাঘ মাসে খড়্গপুর থেকে ছুটিতে কলকাতায় এসে জীবনানন্দ স্ত্রীর অসুস্থতার বাড়াবাড়ি দেখে ছুটির আবেদন করেন।

কিন্তু স্ত্রী সুস্থ না হয়ে ওঠার জন্য আবার ছুটির আবেদন করেন। এবার কলেজ কর্তৃপক্ষ ছুটি মঞ্জুর করেন নি। ১লা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারি) খড়্গপুর কলেজ থেকে কর্তৃপক্ষ তাঁকে বরখাস্ত করেন। মূল কারণ হল ছাত্রসংখ্যা কমে যাওয়ায় আর্থিক অসুবিধার জন্য জীবনানন্দের পদটি বিলোপ করা হয়। ১৩৫৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে এশিয়াটিক সোসাইটিতে একজন গবেষণা-সহায়ক পদে আবেদন করলেও কোন ডাক পাননি। জ্যৈষ্ঠ মাসে সুরুচি মজুমদার নামে এক বিধবা মহিলাকে নিজের আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য ঘর ভাড়া দেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি মহিলার আচরণে ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ হন। দমদম মতিঝিল কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক পদে আবেদন করলেও ব্রজমোহন কলেজে তাঁর প্রাক্তন সহকর্মী ও মতিঝিল কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি তাঁর আবেদন পত্র বিবেচনা করেননি।

১৩৫৯ বঙ্গাব্দের আশ্বিন মাসে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের নতুন সংস্করণ প্রকাশ হয়। কার্তিক মাসে বড়িশা কলেজে চার মাসের লিভ্ ভ্যাকেন্সিতে (বর্তমান নাম বরিশা বিবেকানন্দ কলেজ) জীবনানন্দ যোগদান করেন। অগ্রহায়ণ মাসে কবিপত্নী লাবণ্য দাশ পার্ক সার্কাসের কাছে শিশু বিদ্যাপীঠে (বর্তমান নাম জহর নন্দী স্কুল) শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। ফাল্গুন মাসে শান্তিনিকেতনের বসন্ত উৎসব উপলক্ষে (১৫-১৭ই ফাল্গুন) অনুষ্ঠিত সাহিত্যমেলায় কাব্যশাখার আহ্বায়ক অশোকবিজয় রাহা জীবনানন্দকে সভায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেও তিনি রাজি হননি। এই মাসেই তাঁর বড়িশা বিবেকানন্দ কলেজে কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়। ১৩৬০ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে ডায়মন্ডহারবারে অবস্থিত ফকিরচাঁদ কলেজে অধ্যাপক পদে আবেদন করলেও দূরত্বের জন্য এই চাকরি গ্রহণ করেননি। ১০ই বৈশাখ (২৫শে এপ্রিল) হাওড়া গার্লস' কলেজে (বর্তমান বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজ) বিনা আবেদনে কলেজ পরিচালন সমিতির সভার স্থায়ী অধ্যাপক পদে জীবনানন্দের নিযুক্তির প্রস্তাব গৃহীত হয়। সে বছরই তাঁর 'বনলতা সেন' ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' কর্তৃক পুরস্কৃত হয়। ২রা জ্যৈষ্ঠ মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানে কবিকে সংবর্ধনা জানিয়ে নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃপক্ষ 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের পুরস্কারের নগদ মূল্য একশো টাকা তাঁর হাতে তুলে দেন। ১৬ই আষাঢ় হাওড়া গার্লস কলেজে ১৫০ টাকা বেতনের সঙ্গে ১৫ টাকা ভাতা সহ ইংরেজির অধ্যাপক পদে যোগ দেন।

এই বছর আশ্বিন মাসে পুজোর ছুটিতে সপরিবারে দিল্লি যান। হুমায়ুন কবির ও আতাউর রহমানের সঙ্গে দেখা করে চাকরির কথা বলেন। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী আবুল

কালাম আজাদের সচিব হুমায়ুন কবির দিল্লির একটা কলেজে তাঁর জন্য একটা চাকুরির ব্যবস্থা করেন। কিন্তু জীবনানন্দ কলকাতা ছেড়ে থাকতে রাজি হননি। অগ্রহায়ণ মাসে হুমায়ুন কবির পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা অধিকর্তা পরিমল রায়কে সরকারি কলেজে জীবনানন্দের চাকরির জন্য অনুরোধ করলে কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে তাঁর জন্য চাকরির ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জীবনানন্দ দূরত্বের জন্য এই চাকরি গ্রহণ করেননি। হুমায়ুন কবির জীবনানন্দের পছন্দ অনুযায়ী প্রেসিডেন্সি কলেজে চাকরির জন্য পরিমল রায়কে অনুরোধ করলেও ওই সময়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপকের কোনও পদ শূন্য না থাকায় কিছু ব্যবস্থা হয়নি। ১৪–১৫ই মাঘ (২৮–২৯শে জানুয়ারি) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনেট হলে 'সিগনেট প্রেসে'র উদ্যোগে এক কাব্যপাঠের আসর বসে। উদ্যোক্তাদের পক্ষে আহ্বায়ক ছিলেন ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব, দিলীপকুমার গুপ্ত। প্রথমদিনের সর্বশেষ কবি হিসেবে জীবনানন্দ দাশ কবিতা পাঠ করেন প্রথমে 'বনলতা সেন', তারপর দর্শকদের অনুরোধে 'সুচেতনা' এবং আরও কয়েকটি কবিতা।

১৩৬১ বঙ্গাব্দের (ইং ১৯৫৪) বৈশাখ মাসে 'নাভানা' থেকে 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ২৩শে ভাদ্র হাওড়া গার্লস কলেজের পরিচালন সমিতির সভায় সিদ্ধান্ত হয় যে জীবনানন্দের কর্মকালের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বার্ষিক পঁচিশ টাকা বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে বিভাগীয় প্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য অতিরিক্ত পঁচিশ টাকা বিশেষ ভাতা তাঁকে দেওয়া হবে। ২৬শে আশ্বিন (১৩ই অক্টোবর) গারস্টিন প্লেসে কলকাতা বেতারকেন্দ্রের পুরনো বাড়িতে এক বড় ধরনের কবি সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, বনফুল, সজনীকান্ত, সুধীন্দ্রনাথ, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের সঙ্গে কবিতা পড়েন জীবনানন্দ। এই বছর পূজা সংখ্যায় প্রকাশিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটি তিনি পাঠ করেন। পরেরদিনই অর্থাৎ ২৭শে আশ্বিন (১৪ই অক্টোবর) সন্ধ্যায় দেশপ্রিয় পার্কের কাছে সান্ধ্য ভ্রমণের সময় রাস্তা পার হতে গিয়ে ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতর রূপে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হন। এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁর পাঁজর, কণ্ঠী ও উরুদেশের হাড় ভেঙে যায়। ২৮শে আশ্বিন সঞ্জয় ভট্টাচার্য চিঠি লিখে ভূমেন্দ্র গুহ ও দিলীপ মজুমদারকে পাঠান সজনীকান্ত দাশের কাছে। ৩০শে আশ্বিন (১৭ই অক্টোবর) সজনীকান্ত দাশ ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়কে রাজি করালে, ডাক্তার অজিতকুমার বসু ও ডাক্তার অমলানন্দ দাশকে সঙ্গে নিয়ে বিধানচন্দ্র রায় শম্ভুনাথ হাসপাতালে জীবনানন্দকে দেখতে যান। ৫ই কার্তিক (২২শে অক্টোবর)

শুক্রবার, রাত ১১টা ৩৫ মিনিটে হাসপাতালেই বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৬ই কার্তিক (২৩শে অক্টোবর) এক নাতিদীর্ঘ শোকযাত্রাসহ মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় ও অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

জীবনানন্দ তাঁর জীবদ্দশায় সাহিত্যকর্মের পূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছেন বললে হয়তো অতিকথন দোষে দুষ্ট হতে হবে; তবে তাঁর জীবৎকালে 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থটি 'নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য' পুরস্কার লাভ করেছিল। আর তাঁর মৃত্যুর পর 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' 'একাডেমি' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিল, যার অর্থমূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা। শিক্ষক পিতার সন্তান জীবনানন্দ শিক্ষকতার প্রতি আকর্ষণ উত্তরাধিকার সূত্রেই লাভ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন যুগের অনিশ্চিত পরিস্থিতি অনুধাবন করে এম. এ.-এর সঙ্গে আইনও পড়ে বিকল্প কর্মসংস্থানের ভাবনা করেছিলেন বললে হয়তো ভুল বলা হবে না। যদিও আইনের শেষ পরীক্ষা তিনি আর দেননি। জীবনানন্দের কর্মজীবনের দিকে তাকালে আমরা লক্ষ্য করব ১৯২২-৫৪ এই ৩৩ বৎসরের মধ্যে জীবনানন্দের কর্মহীন কেটেছে ১৯৩০-৩৫ এবং ১৯৪৬-৫০ এই ১০ বৎসর।

কবিপত্নী লাবণ্য দেবীর কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছেন — "উনি যে চাকরী পেতেন না তা নয়। উনি চাকরী করতে চাইতেন না। বারবার বলতেন, বলো তো কি নিদারুণ সময়ের অপচয়। বড়ো ক্ষতি হয়। এভাবে এতটা সময় চলে যাওয়া, আহা, যদি আমার এতটা সঞ্চয় থাকত এভাবে সময় নষ্ট না করলেও চলত।"[৪] লাবণ্য দেবীর এই বক্তব্যের কারণ বোঝা দুষ্কর। দেখা যায় একমাত্র ১৯২৯ সালে খুলনার বাগেরহাট কলেজের চাকরি মাস তিনেক করার পর জীবনানন্দ ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু দিল্লির রামযশ কলেজের চাকরি, বিয়ে করতে এসে দেরি করে কর্মস্থলে যাওয়ায় চলে গিয়েছিল না তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নিয়ে বিতর্ক আছে। ১৯৫০ সালে অবশ্য খড়্গপুর কলেজের চাকরি তিনি ছেড়েছিলেন তবে তা বাধ্য হয়েই। কারণ কলকাতার বাড়িতে অসুস্থ স্ত্রী-পুত্রকে দেখার কেউ ছিল না। সুতরাং কল্পলোকের অধিবাসী কবি চাকরি করতে চাইতেন না। ফলত সংসার স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের মুখোমুখি হত। দেখা গেছে একটি চাকরি পাবার পর আর একটি চাকরি পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। অন্তবর্তীকালীন সময়ে টিউশনি করেছেন। বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হয়েছিলেন। ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা ধার করে অংশীদারি ব্যবসাও করেছেন। যদিও তাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত 'স্বরাজ' পত্রিকায় এবং ১৯৫০ সালের জুন থেকে আগস্ট পর্যন্ত 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকায় কাজ করেছেন। তবে কেউ কেউ বলেছেন — 'দ্বন্দ্ব' পত্রিকার

কাজটি ছিল অবৈতনিক। বন্ধু অচিন্ত্য সেনগুপ্তকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন — "আমি বিশেষ কোন কাজ করছি না আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্প স্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে —"[৫] অথবা সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লেখা একটি পত্রের প্রাসঙ্গিক অংশের উল্লেখ করা যায় —

"প্রিয়বরেষু,

আশা করি ভালো আছেন। বেশি ঠেকে পড়েছি, সেজন্য বিরক্ত করতে হল আপনাকে। এক্ষুণি চার-পাঁচশো টাকার দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন। ... আমার 'জীবনস্মৃতি' আশ্বিন কিংবা কার্তিক থেকে মাসে মাসে লিখব। সবই ভবিষ্যতে, কিন্তু টাকা এখুনি চাই, ... লেখা দিয়ে আপনার সব টাকা শোধ করে দেবো, না হয় ক্যাশে। ক্যাশে শোধ করতে গেলে ছ' সাত মাস (তার বেশি নয়) দেরি হতে পারে।"[৬]

অশোক মিত্র জানিয়েছেন যে তিনি উত্তর ভারতে অবস্থানকালে জীবনানন্দের শিক্ষকতা পদের জন্য প্রার্থনাসূচক যে পত্রসমূহ পেয়েছেন তাতে দেখা যায় — "মাসে তিনশ টাকা হলেও তিনি সন্তুষ্ট।"[৭] অশোক মিত্র আরও জানিয়েছেন — "চূড়ান্ত অভাবগ্রস্ত সংসার, খুবসম্ভব এঁর-ওঁর-তাঁর কাছে সাময়িক সাহায্য ভিক্ষাও করতে হয়েছে তাঁকে।"[৮] জীবনানন্দকে মরণোত্তর 'সাহিত্য একাডেমি' পুরস্কার প্রদান করা হয়েছিল, যার অর্থমূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা। তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে আক্ষেপের সুরে বলতে শুনি — "জীবিত অবস্থায় প্রার্থনায়ও যিনি পাঁচশ' টাকা পান নি, মৃত্যুর পর তাঁর নামে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার-ঘোষণার আর বিড়ম্বনা কেন।" [৯] আর এরই ছায়াপাত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের দাম্পত্য সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। জীবনানন্দের স্ত্রী তাঁর স্বামীর কবি-প্রতিভার স্বরূপ অনুধাবন করতে অপারগ ছিলেন বললে কমই বলা হয়। বলা যায়, তাঁর কবি প্রতিভা সম্পর্কে তিনি অনুৎসাহী ছিলেন। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর ১৩৭৬ বঙ্গাব্দের ২৮শে চৈত্র তিনি 'দেশ' পত্রিকায় 'মানুষ জীবনানন্দ' নামে লিখলেও এবং অনেককে জীবনানন্দ বিষয়ে সাক্ষাৎকার দিলেও এগুলির কিছুই জীবনানন্দ দেখে যেতে পারেননি। বরং জীবনানন্দ আক্ষেপ করে বলেছেন — "আই হ্যাভ নোমিসিস টলস্টয়।" কারণ টলস্টয়ের স্ত্রী সোনিয়া অ্যানড্রিয়েভনা তাঁর স্বামীর বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাসগুলির পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। কিন্তু "জীবনানন্দের স্ত্রী, লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের জীবিতকালে তাঁর সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন না।"[১০] বরং সংসার জীবনে জীবনানন্দের ব্যর্থতা নিয়ে কবির বন্ধু বিরাম মুখোপাধ্যায় লাবণ্য দেবীকে উদ্ধৃত করেছেন — "যে জীবনানন্দকে নিয়ে আপনারা এত নাচানাচি করছেন, কতটুকু তিনি তাঁর পরিবারের জন্য করেছেন?"[১১]

এমনকি সংসার জীবনে তাঁর অসফলতা বা অপূর্ণতা নিয়ে কবির মৃত্যুর পর বলেছেন — "অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তা হলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক-কিছু রেখে গেলেন হয়তো। আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো!" [১২] যদিও লাবণ্য দাশের আটপৌরে সংসারী মহিলার পক্ষে উচ্চশিক্ষিত স্বামী থাকা সত্ত্বেও, অভাব যার নিত্যসঙ্গী তার পক্ষে একটু স্বচ্ছলতা চাওয়াটা অন্যায় নয়, একথাও সত্য। যাই হোক, পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে উদাসীন ও পারিবারিক অস্বচ্ছলতাই যে দাম্পত্য অশান্তির মুখ্য কারণ ছিল তাতেক সন্দেহ নেই। এমনকি এই অশান্তির কথা জীবনানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র অমিতানন্দ দাশের স্মৃতিকথাতেও ধরা পড়েছে। তিনি বলেছেন — "কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁদের দুজনের মধ্যে ভাল মনের মিল হয়নি — আর তার প্রতিফলন রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে।"[১৩] আর তাই গড়িয়াহাটে ট্রাম দুর্ঘটনায় জীবনানন্দের মৃত্যু সমকালে এবং পরবর্তীকালেও অনেকের মনে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করলেও হয়তো সঠিক প্রমাণাভাবে অথবা জীবনানন্দের পরিবারের সদস্যদের বলা ভাল তাঁর স্ত্রীকে অহেতুক প্রশ্নচিহ্নে দাঁড় না করাবার মানসিকতা থেকে কেউ বিশেষ কিছু বলতে চান নি। তবে কেউ কেউ একেবারে বলেন নি তাও নয়। গবেষণার প্রয়োজনেই এই কথাগুলো এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন — বরিশালে কবির বন্ধু সত্যপ্রসন্ন গুহর পুত্র এবং জীবনানন্দের একান্ত স্নেহভাজন অরবিন্দ গুহ 'পূর্বাশা'র সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছ থেকে জীবনানন্দের পারিবারিক বৃত্তান্ত জেনে যেভাবে জানিয়েছেন তা তাঁর ভাষায়ই উদ্ধৃত করা ভালো — "জীবনানন্দের মুখে শুনে তাঁর পারিবারিক অনেক ঘটনাই সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য জেনেছেন সেসব ঘটনা খুব সুখের নয়। স্ত্রীর সঙ্গে প্রতিদিন জীবনান্দের একটা দ্বন্দ্বের কথা সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য অকপটে ব্যক্ত করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এও জানিয়েছেন যে জীবনানন্দ তার থেকে মুক্তি খুঁজছিলেন। সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য লিখেছেন — "আমার মনে হয় জীবনানন্দ ঠিক ট্রাম-দুর্ঘটনায় মারা যাননি। যদিও এই কথাটাই সর্বত্র বলা হয়ে থাকে, এবং আমরা দেখেছি, তথাপি আমার ধারণা তিনি আত্মহত্যা করেছেন।"[১৪] যাই হোক, উত্তাল সময়ের স্রোতে দাঁড়িয়েও যাঁর চেতনাপ্রবাহ ছিল অন্তর্লীন, যিনি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের ভাষায় "ভাবনার স্বকীয়তায় ক্ষণভঙ্গুর সাময়িকতাকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের রহস্য সন্ধানে "শাশ্বত মীমাংসা'র পথ খুঁজে চললেন, যেখানে কোনোদিন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।" [১৫] সেই মানুষটিই শেষ পর্যন্ত নিজের সাথে হয়তো আর যুঝতে না পেরে শামসুর রহমানের ভাষায়, 'অসীম সৈকতে' মিলিয়ে গেলেন। 'বনলতা সেন'-এর কাছে জীবনানন্দ 'দুদন্ড শান্তি' চেয়েছিলেন।

শেষ জীবনের যে বেশ কিছুদিন তিনি হাওড়া গার্লস স্কুলে পড়িয়েছিলেন, সেখানকার ছায়াঘেরা স্নিগ্ধ অবকাশে সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপিকার সান্নিধ্যে দু'দন্ড শান্তি ও ছাত্রীদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা, সম্মান তিনি পেয়েছিলেন। জীবনানন্দের চেতন-অবচেতন মনে যে মৃত্যুভাবনা গভীরভাবে প্রোথিত ছিল তা যান্ত্রিকতার বেশে তাঁকে তাড়া করেছিল। যন্ত্রের আঘাতে অর্থাৎ ট্রামে চাপা পড়ে মারা গেলেন জীবানানন্দ। আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রময় নিয়তি বোধহয় এটাই। আত্মহত্যা অথবা অন্যমনস্কতাজনিত দুর্ঘটনা যে রূপেই মৃত্যু এসে থাকুক না কেন তা হয়তো সাময়িক ছেদ চিহ্ন মাত্র। বাংলা কবিতা ও উপন্যাস-ছোটগল্পের আসরে জীবনানন্দের অস্তিত্ব সময়ের সময়হীন সংকেতে চির ভাস্বর — এই কথাটি আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে অনুধাবনে ব্রতী হব।

উল্লেখপঞ্জি

১। জীবনানন্দ দাশের সংক্ষিপ্ত জীবনী, জীবনানন্দ স্মৃতি, উজ্জ্বলকুমার দাস সম্পাদিত, পৃষ্ঠা – ৯, প্রকাশক – নির্মল কুমার সাহা, সাহিত্যম্, কলকাতা – ৭০০ ০৭৩, প্রথম প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা রজতজয়ন্তী বর্ষ, জানুয়ারি ২০০০

২। মানুষ জীবনানন্দ, লাবণ্য দাশ, উৎস – জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা – ৪২, প্রকাশক – সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৯, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা জানুয়ারী ১৯৯৯/মাঘ ১৪০৫

৩। অপ্রকাশিত জীবনানন্দ, সম্পাদনা ঃ ভূমেন্দ্র গুহ, একদিন শতাব্দীর শেষে (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন), প্রধান সম্পাদক – তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৫৫, প্রকাশক – অনিল ভট্টাচার্য, কলকাতা – ৭০০ ০০৭, প্রথম প্রকাশ – ২৩ মার্চ ২০০০

৪। প্রফেসর — মৃগয়া, জীবনানন্দ-চর্চায় সমকালীনতার অন্য মাত্রা ঃ শিক্ষকতা, শিক্ষাভাবনা ও শিক্ষক-আন্দোলন, তপন গোস্বামী, উৎস – একদিন শতাব্দীর শেষে (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন), প্রধান সম্পাদক – তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩৬১, প্রকাশক – অনিল ভট্টাচার্য, কলকাতা – ৭০০ ০০৭, প্রথম প্রকাশ – ২৩ মার্চ ২০০০

৫। উৎস – তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬২

৬। উৎস – তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬২

৭। উৎস – তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬৩

৮। উৎস – তদেব, পৃষ্ঠা – ৩৬৩

৯। (বেদনার সম্বন্ধ, সঞ্জয় ভট্টাচার্য) জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা – ২০, প্রকাশক – সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৯, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা/জানুয়ারী ১৯৯৯/মাঘ ১৪০৫

১০। অপ্রকাশিত জীবনানন্দ, সম্পাদনা ঃ ভূমেন্দ্র গুহ, উৎস – একদিন শতাব্দীর শেষে (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন), প্রধান সম্পাদক – তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩১, প্রকাশক – অনিল ভট্টাচার্য, কলকাতা – ৭০০ ০০৭, প্রথম প্রকাশ – ২৩ মার্চ ২০০০

১১। প্রফেসর — মৃগয়া, জীবনানন্দ-চর্চায় সমকালীনতার অন্য মাত্রা ঃ শিক্ষকতা, শিক্ষাভাবনা ও শিক্ষক-আন্দোলন, তপন গোস্বামী, উৎস – একদিন শতাব্দীর শেষে (জীবনানন্দ স্মারক সংকলন), প্রধান সম্পাদক – তীর্থঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা – ৩৬৮, প্রকাশক – অনিল ভট্টাচার্য, কলকাতা – ৭০০ ০০৭, প্রথম প্রকাশ – ২৩ মার্চ ২০০০, (মূল উৎস – জীবনানন্দ চর্চার সমস্যা — প্রভাতকুমার দাস, পৃষ্ঠা – ৫৯, হার্দ্য, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৯)

১২। 'ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না ...', ভূমেন্দ্র গুহ, উৎস – জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত, পৃষ্ঠা – ১৪৪, প্রকাশক – সমীরকুমার নাথ, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা – ৭০০ ০২৯, প্রথম প্রকাশ – বইমেলা/জানুয়ারী ১৯৯৯/মাঘ ১৪০৫

১৩। (আমার জ্যাঠামশাই, অমিতানন্দ দাশ) জীবনানন্দ ঃ জীবন আর সৃষ্টি, সুব্রত রুদ্র সম্পাদিত (তদেব), পৃষ্ঠা – ১০৭-১০৮

১৪। জীবনানন্দ এবং আরও কয়েকজন, অরবিন্দ গুহ, বিভাব, জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯, সম্পাদক – সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, (এই সংখ্যার আমন্ত্রিত সম্পাদক – ভূমেন্দ্র গুহ), পৃষ্ঠা – ৫১৫, প্রকাশক – সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, কলকাতা – ৭০০ ০৬৮,

১৫। হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্য, বিভাব, জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ সংখ্যা – ১৪০৫/১৯৯৮-৯৯, সম্পাদক – সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত (তদেব), পৃষ্ঠা – ৫৯২